Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-IV, July 2022, Page No.19-24
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামজীবন

তরুণকান্তি মন্ডল
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরসুনা কলেজ

Abstract:
Abu Isahaq's 'Surya-Dighal Bari' is an impeccable novel. The novel abounds in contemporary political and social reality. There is a perfect amalgamation of a great political history and the very common people of the country. The author has shown the simplest lifestyles and livelihoods of East Bengal in this novel. The novel is Pen Picture of famine, riots, independence and partition etc. All these are reflected indirectly in the rural life presented in the novel. The novel itself a social document of the rural life of Bangladesh during the Post-World War II era, when it was submerged under superstition and religious orthodoxy.

Keywords: rural life, famine, riot, society, occupation, women independence.

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) সংখ্যার বিচারের তাঁর রচনাসম্ভার স্বল্প হলেও গুণমানে এবং স্বাতন্ত্যবোধে তিনি অদ্বিতীয়। আবু ইসহাক রচিত বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হল 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'। কথাসাহিত্যিক আবু ইসহাক মাত্র কুড়ি বছর বয়সে ১৯৪৬ সালে তাঁর কালজয়ী উপন্যাসটি রচনা করেন। জনপ্রিয় এই উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি ১৯৫০-৫১ খ্রিস্টাব্দে ধারাবাহিকভাবে 'নওবাহার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আবু ইসহাকের 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি ১৯৫৫তে প্রকাশিত হলেও এর কাহিনীর উপজীব্য ১৩৫০ সালের মন্বন্তর ও মুসলিম সমাজব্যবস্থা। গ্রামীণ জীবনের সহজ সরল আলেখ্য হিসেবে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' দুই বাংলার পাঠক সমাজকে আপ্লুত করে। লেখকও পূর্ব বাংলার গ্রামীণ জীবনের দ্বন্দ্বহীন জীবনযাত্রাই দেখিয়েছেন। যদিও উপন্যাসের প্রকাশকালে পূর্ববঙ্গের সর্বত্রই চলছে ধর্মের নামে উন্মাদনা, তবু লেখক সহমর্মিতার স্পর্শে কাহিনীতে দেখাতে চেয়েছেন ধর্ম নয়, বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা বা সংগ্রামই মানুষের জন্মগত অধিকার।

পঞ্চাশের মন্বন্তরে দল বেঁধে গ্রামের মানুষ শহরে যায়। তাদের আশা— সেখানে যদি কোনো বেঁচে থাকার মতো খাদ্য পাওয়া যায়; এ ব্যতীত জীবনটা বাঁচিয়ে রাখার অন্য কোনও পথ তাদের সামনে ছিল না। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের স্থান দেওয়ার ক্ষমতা শহরের নেই। সভ্যতার ঊষা থেকেই তো খাবার জুটিয়েছে গ্রাম, এই সব দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত মানুষের একাংশের জীবনলীলা শহরেই শেষ হয়ে যায়। গ্রাম থেকে শহরে গিয়ে যারা বেঁচেছিল, তাঁরা দুচোখে স্বপ্ন দেখে নতুন ফসলের, অনুভব করে সোঁদা মাটির

গন্ধ। ছেলেমেয়ের হাত ধরে শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসে জয়গুন। গ্রামে ফিরলেও সে হারানো সম্পত্তি ফিরে পায় না, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সম্পত্তির মালিকানা বদল হয়েছে। জয়গুন গ্রামে আসে একটিমাত্র আশা নিয়ে, গ্রামে ভিটে আছে একটা। জয়গুন বাড়ি বাড়ি ঘর লেপে, ধান ভেনে, চিঁড়ে কুটে, বনের শাকপাতা তুলে বিক্রি করে নিজের ও সন্তানদের ক্ষুণ্নিবৃত্তি নিবারণ করে। গ্রাম্যনারী জয়গুনের জীবিকা গ্রামজীবনের প্রেক্ষিতেই সম্ভব।

আবু ইসহাক তাঁর উপন্যাসে যে গ্রামজীবনের ছবি এঁকেছেন সেখানে আমরা দেখি, গ্রাম্য মানুষের আভিজাত্যের প্রতীক হয়ে ওঠে কোনও বহুমূল্য সম্পদ নয়, প্রকৃতির সৃষ্টি তালগাছ। সূর্য-দীঘল বাড়ীর তালগাছটা গ্রামের মানুষের গর্বের বস্তু, তাদের বনেদিয়ানার চিহ্ন—

> ''ঐ আসমাইন্যা তালগাছটা, বুঝলানি মিয়া? আমাগো ঘর বহুত পুরানা। ঐ আসমানি তালগাছটা সাক্ষী। দেহাও দেখি, অত বুড়া আর ডাঙার গাছ একটা তোমাগ মুল্লুকে? ওহো ঠনঠন। তোমাজ এই দিগের বড় তালগাছ আমাগ গেরামের খাজুর গাছের হমান।''[১]

এক গ্রামের মানুষের আভিজাত্যবোধকে অন্য গ্রামের মানুষেরা সম্মান করে। তাই দেখা যায়, এখানকার কালো কুৎসিত মেয়েও কৌলীন্যের জেরে চর অঞ্চলের সম্পন্ন গৃহস্থ পরিবারের বধূ হয়ে যেতে পারে। জয়গুনের প্রথম জীবনের স্বামী ছিল জব্বর মুন্সী। জব্বর মুন্সীর মৃত্যু হলে তার জীবনে দ্বিতীয় স্বামী হিসেবে এসেছে করিম বক্স। করিম বক্সের মধ্যে মনুষ্যত্বের ছিঁটেফোঁটাও নেই। একদিন দুর্ভিক্ষের দিনে কোনো কারণ ছাড়াই সে তার স্ত্রী জয়গুনকে তালাক দিল। আর যেহেতু বংশের 'চেরাগ' জ্বালবে পুত্র সন্তান, তাই একমাত্র কাসুকে নিজের কাছে রেখে দুইকন্যাসহ জয়গুনকে সে বিদায় করে দিল। দুর্ভিক্ষের দিনে অনাহারে যখন স্বামী করিম বক্সকে সব থেকে বেশি প্রয়োজন ছিল জয়গুনের ঠিক তখনই এই বিচ্ছেদ। দাঁতে দাঁত চেপে গ্রামের আর পাঁচ জনের মতো করে জয়গুনও সন্তানদের হাত ধরে শহরে গেছে একটু খানি ফ্যানের স্বপ্ন নিয়ে। দু'মুঠো অন্নের আশায় সেদিন শহরে ভিড় করা নিঃসম্বল গ্রামের মানুষদের যে করুণ পরিণতি ইতিহাস তার সাক্ষী। অনাহারে শহরের জীবন ছেড়ে জয়গুন ও শফীদের পরিবারকে গ্রামেই ফিরতে হয়েছে। দুর্ভিক্ষের এই দিনগুলোতে কোলের মেয়েটিও মারা গেছে তখন। সব হারানো নিরাশ্রয় এই দুই পরিবার শেষমেশ একটি সূর্য-দীঘল বাড়ীতেই আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সূর্য-দীঘল বাড়ীর পাশ দিয়ে হাঁটতেও গ্রামের মানুষ তখন ভয় পায়—

> ''সূর্য-দীঘল বাড়ীতে মানুষ টিকতে পারে না। যে বাস করে তার বংশ ধ্বংস হয়। বংশে বাতি দেওয়ার লোক থাকে না। গ্রামের সমস্ত বাড়িই উত্তর-দক্ষিণ প্রসারী।''[২]

এহেন বাড়িতেই কেবলমাত্র নিজের সাহসের জোরে জোড়াতালি দিয়ে থেকে যায় জয়গুন। জীবিকা হিসেবে শফীর মা বেছে নিয়েছে বহু প্রাচীন সেই ভিক্ষাবৃত্তিকে। কিন্তু জয়গুন কোনোদিন ভিক্ষা করেনি। সমাজের লাল চোখ উপেক্ষা করে পর্দার বাইরে গিয়ে উত্তর থেকে ট্রেনে চাল এনে সওদা করেছে সে।

গ্রামীণ জীবনযাত্রায় কোনো প্রকারেই সমাজ পর্দাহীন জয়গুনকে মেনে নিতে পারে না, সমাজের অন্যতম সমাজপতি গদু প্রধান বিহিত করতে উদ্যত, কিন্তু এই বিহিত সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের কাম্য নয়। স্বামী পরিত্যাক্তা নারী হলো জয়গুন। পিতৃহীন অনাথ বালক-বালিকার মুখে নিজে না খেটে খাদ্য দেবে কেমন করে একথা গদু প্রধানদের না ভাবলেও চলতে পারে, কিন্তু জয়নগুনের চলে না। তাই মসজিদের ইমাম ডিম না নিলেও জয়নগুনের বিশেষ কিছু আসে যায় না, অথচ তাকেই ক্ষুণ্নিবৃত্তির জন্যে গাছ বিক্রি করতে

হয়। জয়গুনকে তাই জীবিকা অন্বেষণে বের হতে হয়েছে। বেঁচে থাকার জন্যে, আত্মনির্ভরতার জন্যে গ্রামীণ পরিবেশের প্রতিকূলতায় এ ব্যতীত তার কিছুই করার ছিল না, কেননা এ সমাজ যে তার সন্তানদের দায়িত্ব বহন করবে না তা সে নিশ্চিতভাবে জানে। জয়গুনের মতো হত দরিদ্র মানুষেরা ভেবেছিল দেশ স্বাধীন হলে চালের দাম সস্তা হবে, তারা দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পারবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে চালের দাম আরও বেড়ে যায়। গ্রামে কালোবাজারি, বস্ত্র সংকট দেখা দেয়। গদু প্রধানের মতো মানুষেরা কালোবাজারির কালো টাকায় ফুলে ফেঁপে ওঠে। গদু প্রধানের মতো মানুষেরা চাল গুদামজাত করে চালের দাম আকাশছোঁয়া করে তোলে। ফুড কমিটির সেক্রেটারি রশীদ মোল্লা ইদের দিনের বরাদ্দ রেশনের চিনি সাধারণ মানুষকে না দিয়ে ব্ল্যাকে তা বিক্রি করে দেয়।

ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে মুসলমান প্রধান গ্রামজীবনের ছবি এঁকেছেন। সেই যাপনের ইতিহাসে দেখা যায় পুরুষের বহুবিবাহ, নারীর বাল্য বিবাহ, সতীন, তালাকের কথা বারে বারে এসেছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল গদু প্রধান তিনটি স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও আবার জয়গুনকে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কাঠুরিয়া বউয়ের কিস্‌সায় মুসলমান ধর্মের পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যবাদ, নারীর ওপর অত্যাচারের কথা আছে। মুসলমান ধর্মে পুরুষের কাছে নারীর মর্যাদা অতি তুচ্ছ। সেখানে নারী পুরুষের স্বেচ্ছাচারের উপাদান মাত্র। তাই আমরা দেখি, করিম বক্স তার প্রথম স্ত্রী মেহেরনকে হত্যা করে, জনগুনকে বিয়ে করে, আবার দুর্ভিক্ষের সময়ে অসহায় জয়নগুনকে দুই শিশু সন্তানসহ তালাক দেয়, তারপর আবার আঞ্জুমানকে বিয়ে করে। পুরুষ নিজের প্রয়োজনে নারীকে ব্যবহার করতে চায়, করিমবক্সও জনগুনকে আবার নিকা করতে চায়। অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রামে পর্দা প্রথা প্রচলিত। পর্দাহীনা নারীর সেখানে কোনো সামাজিক সম্মান নেই। জয়গুন তার হাঁসের দেওয়া প্রথম দিনের ডিম মসজিদে পাঠালে ইমাম তা ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে—

> "ইমাম সায়েব চমকে ওঠেন ও-তুই! তওবা! তওবা! হারাম! হারাম! তিনি ডিম ক'টার দিকে তর্জনীর নির্দেশ দিয়ে বলেন নিয়া যান জলদি আমার কাছ থ্যাইক্যা। মসজিদের মধ্যে কে আনল এই আণ্ডা? ফিরাইয়া দ্যাও অগুলি। বেপর্দা আওরতের চিজ। ছি! ছি! ছি!"[৩]

গ্রাম্য ইমামের কাছে বেপর্দা নারী রাস্তার কুকুরের সমান। দারিদ্র্যময় গ্রাম্যজীবনে ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে নেমে আসে জয়গুনের জীবনে। মায়মুনের বিয়ের দিন জয়গুনকে তওবা করতে হয় যে, সে আর বাড়ির বাইরে বেরোবে না। পুরুষশাসিত গ্রামসমাজে অসহায় নারী পুরুষের হাতে কেমনভাবে অপমানিত, লাঞ্ছিত, অত্যাচারিত হয় তা ঔপন্যাসিক নানা ভাবে দেখিয়েছেন।

সমাজে নিম্নবিত্তি মানুষদের জীবনসংগ্রাম, তাদের বিপন্ন অস্তিত্বের জীবনচিত্র 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজে দেখা যায় যুক্তি-তর্ক এবং বিতর্কের ঊর্ধ্বে উঠে সংস্কার এবং বিশ্বাসের মধ্যে বদ্ধমূল থাকা। গ্রামের মধ্যে কারোর কলেরা, বসন্ত অথবা যেকোনও রোগে আক্রান্ত হলে তার কারণ অনুসন্ধান না করে ধর্মীয় দৃষ্টিতে সমাধান করার চেষ্টা করে থাকে। জয়গুনও শফীর মার মতো সমাজের অধিকাংশ লোকসমাজ ভূত-পেত্নী, জিন-পরী ইত্যাদির অস্তিত্বে বিশ্বাসী, অশরীরী আত্মাদের প্রতিরোধে ফকির ওঝার দেওয়া তেলপড়া, জল পড়া, কিংবা ধূলাপড়ায় বিশ্বাসী সহজ সরল মানুষগুলির প্রত্যয়ের দিকটি উপন্যাসে পরলক্ষিত।

মুসলিম সমাজে পর্দাপ্রথার বিশেষ প্রচলন ছিল। তাদের বিশ্বাস পর্দাপ্রথাকে গ্রহণ না করলে চল্লিশ বছরের এবাদত খোদার দরবারে কবুল হয় না। আবার তাদের বিবাহ রীতিতে দেখা গেছে, তারা সাক্ষী ও

উকিলের উপস্থিতিতে পাত্রপক্ষকে পণ দেওয়ার মাধ্যমে 'নিকাহ' সম্পন্ন করতেন। তৎকালিন মুসলমান সমাজে কুসংস্কার এতটাই বদ্ধমূল ছিল যে অনেকাংশেই যে, জয়গুনের প্রাক্তন স্বামী করিম বক্স তাদের পুত্রসন্তান কাসু যাতে তার মায়ের কাছে ফিরে না যেতে পারে তার জন্য করিম বক্স তার মনে একটা কৃত্রিম ভয় ঢুকিয়ে দিয়েছিল। তেঁতুল গাছে গোঙাবুড়ী দেখার পর থেকেই কাসুর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে।

সমাজের মধ্যে বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল। অসম বয়সী পাত্রের সঙ্গে বিবাহপ্রথা সমাজে অনুমোদিত ছিল। উপন্যাসে দেখা যায়, জয়গুনের কন্যা মায়মুনকে অসমবয়সী ওসমানের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়। তাছাড়া মুসলমান সমাজে নারী ও পুরুষ উভয় ক্ষেত্রেই বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন ছিল। উপন্যাসের অন্যতম কেন্দ্রীয় চরিত্র জয়গুনও এই বহুবিবাহের শিকার। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক জয়গুনকে ব্যক্তিত্বময়ী ও প্রতিবাদী নারী হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তবে তথাকথিত সমাজহিতৈষীদের উদ্দেশ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর কঠিন হলেও আপন বিবেকের কাছে মাঝে মাঝে সে অপরাধবোধে পীড়িত হয়। ধর্মীয় বিধানের মধ্যে দিয়ে তথাকথিত মুসলমান সমাজের নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা পঞ্জিকা মেনে চলার রীতিতে বিশ্বাসী ছিল। যথাযথভাবে পঞ্জিকা দেখেই তারা শুভক্ষণে নির্ঘণ্ট বের করতো। ফকির গজাল ফুঁ-ফা দিএ তুক-তাক করে মন্ত্রসিদ্ধ গজাল করিম বকসের হাতে তুলি দিয়ে নির্দেশ দেয় অমাবস্যার দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর যেন সূর্য-দীঘল বাড়ীর চার কোণে পুঁতে দেয়। একাকী এই কাজ করতে যেতে ভয় পেলে ফকির জোবেদ আলী করিম বকসের উপর রক্ষা বন্ধনের মন্ত্র পড়ে তার বুকে ও চোখে সাতবার ফুঁ দিয়ে জানায়—

> ''ডেরর মাজা ভাইঙ্গা দিছি। যাও এইবার, আর ডর নাই।''[৪]

যাদুমন্ত্রের কার্যকরী ক্ষমতার প্রতি লোকসাধারণের আস্থা বা বিশ্বাস অতিপ্রাচীনকাল থেকেই চলে আসছে। এই উপন্যাসে দেখা যায় করিম বকস জয়গুনকে তালাক দিয়ে আঞ্জুমানকে নিকাহ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে করিম বকস আবার জয়গুনের প্রতি আসক্ত হয়। কিন্তু জয়গুন সমস্ত প্রলোভন এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনে ফিরে যেতে অসম্মত হয়। কিন্তু তারপরেও করিম বকস মরিয়া হয়ে জয়গুনকে বিবাহ করার অভিপ্রায়ে যাদুর আশ্রয় নেয় এবং শফির মার হাতে একটি পান দিয়ে জানায়—

> ''তোমার ঘরে ডাক দিয়া এই পানডা খাওয়াইয়া দিও। নাগর বাইদ্যার হাতে পায়ে ধইরা এইডা জোগাড় করেছি।''[৫]

উপন্যাসের প্রথম থেকেই দেখা যায় জয়গুনকে, যে বিচার ও ব্যক্তিত্বে অজস্র প্রতিকূলতার মধ্যে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্য-দীঘল বাড়ীর ভৌতিক অভিশাপ কাটানোর জন্য সে সাহায্য নিয়েছিল ফকিরের কিন্তু তার জন্য ফকিরের অন্যায় আচরণকে সে মানেনি। অসুস্থ কাসুরের চিকিৎসায় সে ফকিরর ভরসা না করে ডেকে আনে ডাক্তার রমেশ চক্রবর্তীকে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্য দিয়ে দেখা যায়, জয়গুনের নিজস্ব ভুবন তৈরি হয়ে যাচ্ছে। মায়মুনের বিয়ের অনুষ্ঠানে জয়গুন বাইরে না বেরনোর জন্য তোবা করতে বাধ্য হয়েছে।

স্বাধীনতা মানুষের খাদ্য এবং বস্ত্রের সহজ সংস্থান করে দিতে পারেনি। এরসাথে যুক্ত হলো মানুষের অসততা। মহাজনেরা কম দামে বিক্রি করবে না বলে বাজার থেকে চাল তুলে নিয়েছে। ফুড কমিটির সেক্রেটারি সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করেছে। চিনির সরবরাহ হয়েছিল ঈদ উপলক্ষে, সেক্রেটারি নিজের সঙ্গী সাথীদের নিজের ইচ্ছেমত বণ্টন করে এবং ভাইকে দিয়ে বাকি চিনি দোকান থেকে বিক্রি করায়। আবু ইসহাক প্রতি পরতে দেখিয়েছেন অসহায় মানুষের প্রতিবাদের ভাষাকে, দেখালেন সহ্য করার ক্ষমতাকে।

তাই ব্ল্যাকে চিনি পাওয়া গেলেও হাসু তা কেনে না। এই প্রতিবাদ দেখায় বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থার মধ্যে থেকেই সর্বহারা মানুষের স্বর।

১৫ আগস্ট স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের ছবিটি লেখক বর্ণনা করেছেন অসামান্য লেখনীতে। হাসু শহর থেকে ফিরে আসে স্বাধীনতা দিবসের উৎসাহ এবং আনন্দ নিয়ে। সে নিশান হাতে মিছিলে গেছে, মোট বয়ে অর্থ রোজগার করে গেছে। সে চায় তার বাড়ীতে উড়ুক নিশান। স্বাধীনতা আসায় ওরা ভাবে রাত কেটে হয়তো সূর্য উঠবে। জয়গুনের সঙ্গিনী লালুর মা ও গোদির মা পরস্পরের ছেলেমেয়ের বিয়ে ঠিক করে ফেলে। জীবিকার সংগ্রামে ব্যস্ত থেকেও জীবনের স্বাভাবিক গতির কথা তারা ভোলে না। এমনকি যথা সম্পন্ন জীবনযাত্রার আকাঙ্ক্ষা থেকেও সরে আসে না। জীবন তাদের এই অভিজ্ঞতা শিখিয়েছে।

এই উপন্যাসের সংলাপ একেবারেই মাটি ঘেঁষা। সহজ জীবনযাত্রার ছাপ তাদের কথায়। প্রতিটি পরতে জড়িয়ে আছে কুসংস্কারের প্রতি গ্রামীণ মানুষের অন্ধ বিশ্বাসের ছবি। দুর্ভিক্ষে মানুষ স্বপ্ন দেখে, দেশ স্বাধীন হলে চালের দাম কমবে। দেশ একদিন স্বাধীন হয় কিন্তু জয়গুনদের বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষার হয় সমাধি। শহরের হোটেলে খাবারের সমারোহ, মজুতদারের গুদামে চালের প্রাচুর্য দেখে তাদের জিভ শুকিয়ে যায়। আস্তাকুঁড়ে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে তারা ক্লান্ত, অভুক্ত অবস্থায় তারা হার মানতে বাধ্য হয়। অগত্যা তারা গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু মাথার উপর ছাদ তো আগেই বেঁচে নিঃশেষ করে দিয়েছে। তাই পরিত্যক্ত সূর্য-দীঘল বাড়িকে তারা বসবাসের উপযোগী করে নেয়। কিন্তু এই বাড়ি পরিত্যক্ত সূর্য-দীঘল বাড়ি পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রসারিত। জনশ্রুতি আছে এমন বাড়িতে মানুষের ঠাঁই হয় না। কেউ বলে অপদেবতা বাস করে বাড়িটিতে। কিন্তু যাদের থাকার জায়গা নেই অন্যত্র, তাদের শুভ অশুভ নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা অপ্রাসঙ্গিক। জয়গুন ও শফীর মা এক ফকিরের সাহায্যে তাবিজ রোপণ করে সূর্য-দীঘল বাড়ীর চারটি কোণে। এই ভাবেই তারা এই বাড়িতে থাকতে শুরু করে। শহর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে আসার পর তারা এবার মাথার উপর ছাদ পেল। যদিও এই ভিটের আট আনা অংশের মালিক জয়গুন, আর বাকি আট আনার অংশীদার জয়নগুনের নাবালক ভাইপো-শফী। ঠিক এরপরেই শুরু হয় তাদের প্লাবনকাল।

শুধু দেশভাগজনিত সমস্যা নয়, দুর্ভিক্ষের প্রভাব কীভাবে এই উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের জীবনকে আলোড়িত করে, তার বর্ণনাও আছে। চালের দাম বেড়েছে, ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অনেক মানুষ। ক্ষুধার্ত মানুষের ঠাঁই হয় না কোথাও। জয়গুনদেরও হয়নি। তাই তারা গ্রামে ফিরে আসে। নিশ্চয়তা কোথাও নেই, দুর্ভিক্ষের দিনে কেউ ভিক্ষা দেয় না। এক্ষেত্রেও আরও একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, তা হল এই দুর্ভিক্ষ শুধু ভাতের নয়, কাপড়েরও। একটি সুগঠিত কাহিনির স্বল্প পরিসরে মাঝে মাঝেই ফুটে উঠেছে দুর্ভিক্ষজনিত দারিদ্র্য, যন্ত্রণার করুণ ছবি। একটা অংশ দেখা যায় জয়গুন, মায়মুন ও হাসু খেতে বসেছে কিন্তু হাঁড়িতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ভাত নেই। জয়গুণ অসুস্থতার অজুহাতে কিছু খাবে না বলে হাসুকে খেতে দেয়। হাসু এই শুনে বলে তার পেট ভরে গিয়েছে। এভাবে মায়ের মন ছেলে বোঝে, আর ছেলের মন মা।
আবু ইসহাক 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের মন্বন্তর, দাঙ্গা, স্বাধীনতা লাভ এবং দেশভাগের মতো ঘটনাগুলিকে নানা অনুষঙ্গে নিয়ে এসেছেন। উপন্যাসে চিত্রিত গ্রামজীবনেও সেই ঘটনার রেশগুলিও পরোক্ষভাবে পৌঁছে গেছে। দেশভাগের পরে পূর্ববঙ্গে সংখ্যালঘু বর্ণহিন্দুদের মধ্যে বাস্তুত্যাগের প্রবণতা দেখা যায়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মনে পারস্পরিক অবিশ্বাস তৈরী হয়। সেখানে মুসলমানদের

অত্যাচারের ভয়ে হরেন ডাক্তার, জগদীশ ডাক্তারসহ অনেকেই দেশত্যাগ করেছএন। কিন্তু রমেশ ডাক্তার দেশত্যাগ করতে চান না। স্ত্রীর সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে তিনি জানিয়েছেন—

> "এখানে কে তোমাকে মারছে শুনি? কতগুলো পশুর প্ররোচনায় যা হয়েছিল তা আর হবে না দেখে নিয়ো। ভায়ের বুকে ছুরি বসিয়ে আনন্দ পাওয়া যায় না সবাই বুঝতে পেরেছে। ভায়ের বুকের রক্তে যে করুণ অভিজ্ঞতা হল, হিন্দু-মুসলমানের মন থেকে তা সহজে মুছে যাবে না।"[৬]

আবু ইসহাক এই উপন্যাসে যে গ্রাম্যজীবনের পরিচয় দিয়েছেন সেই গ্রামের কিন্ত কোনো নাম নেই। আসলে জয়গুনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামটি বাংলাদেশের যে কোনো গ্রামের ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য। তাই ঔপন্যাসিক কোনো নির্দিষ্ট নামের গ্রামকে অঙ্কিত করেননি, তিনি সার্বিকভাবে বাংলাদেশের গ্রামজীবনকেই অঙ্কিত করতে চেয়েছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুসংস্কার ও ধর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুসংস্কার ও ধর্মের অন্ধকারে নিমজ্জিত গ্রামজীবনকে জানার ক্ষেত্রে 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসটি একটি বিশ্বস্ত সামাজিক দলিল হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের পরিমণ্ডলে দেখা যায় যে, জয়গুন এবং শফরী মা নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আশ্রয় নিয়েছে সূর্য-দীঘল বাড়ীতে। আর তাকে কেন্দ্র করে শোষিত ও বঞ্চিত গ্রামীণ মানুষের নির্মম জীবনসংগ্রামের বস্তুনিষ্ঠরূপ নির্মাণে আবু ইসহাকের দক্ষতা 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' উপন্যাসের অন্যতম সার্থকতা। অনমনীয় দৃঢ়তায় ঔপন্যাসিক আবু ইসহাক জয়গুন চরিত্রটিকে প্রাণ দিয়েছেন। উপন্যাসে করিম বকস, হাসু গদু প্রধান কিছু প্রাধান্য বিস্তার করলেও মুখ্য চরিত্র কিন্তু জয়গুনই। তবে অনান্য চরিত্র জীবনের জটিলতায় না গিয়ে সহজ সরলভাবে উপন্যাসে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রায় প্রতিটি চরিত্রই বাস্তবোচিত হয়েছে, তবে এই সব চরিত্রের মধ্যে ঔপন্যাসিক জীবনের উপলব্ধিবোধ গাঢ়ভাবে অঙ্কিত করতে পারেননি। উপন্যাসের ভাষা সহজ, সরল, প্রাণবন্ত। পূর্ববঙ্গের জীবনের সাথে সুরভিত।

তথ্যসূত্র:

১. ইসহাক আবু, সূর্য-দীঘল বাড়ী, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, এপ্রিল ২০১২, পৃ: ৯।
২. তদেব, পৃ: ৮।
৩. তদেব, পৃ: ১৬।
৪. তদেব, পৃ: ১৩।
৫. তদেব, পৃ.: ১২৩।
৬. তদেব, পৃ: ১০৭।